সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৭ কার্তিক ১৪২২ ● শনিবার ১৪ নভেম্বর ২০১৫ ● ২ টাকা

শিশু শিক্ষা ও প্রযত্ন

হিরণ্ময় সাহা

যে কোনও সমাজ গঠনের সচেতন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিশুশিক্ষা। শিশু বলতে আমরা এখানে এক থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাদের কথাই বলছি। এই বয়সটা মানুষের জীবনে বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সেই কোনও শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জগতের বৈচিত্র্যময় রূপ, রঙ, তরঙ্গ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণ করে যা কিন্তু শিশুর অন্তর্জগতে স্থায়ী ছাপ ফেলে। খেলাধূলা করা শিশু বিকাশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুরা খেলার জন্যই খেলা করে এবং আনন্দ পায়। তারা শেখার জন্য খেলে না কিন্তু খেলতে খেলতে শেখে। শিশুরা যা দেখে, শোনে এবং অনুভব করে তা সবই তারা তাদের খেলায় প্রকাশ করে। খেলার মাধ্যমে তারা নকল করে আবার নতুনত্ব সৃষ্টি করে। বাস্তবজগত-কল্পনাজগত থেকে তারা তাদের পছন্দমতো উপকরণ খুঁজে নিয়ে খেলার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে শিশুদের এই আপনমনের খেলার খেয়াল রাখা এবং প্রয়োজন মাফিক সাহায্য করা, প্রশংসা করা এবং দিক নির্দেশ করা। শিশুদের যাতে খেলার প্রতি আগ্রহ বজায় থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, সামগ্রী ও পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষকদের ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কোনও মানুষের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন ও চরিত্রগঠনের অনেকটাই নির্ভর করে তার এই শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ। তাই পৃথিবীর সর্বত্রই শৈশবকালীন শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষাবিদরাও এই শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মন্তেসরি পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতালিতে মারিয়া মন্তেসরি শিশুদের জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা ১৯০৭ সালে প্রথম চালু করেন। তারপর থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই মন্তেসরি শিক্ষাপদ্ধতি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। মারিয়া মন্তেসরি নিজে একজন ডাক্তার ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে প্রথম থেকে ৬ বছরের শিশুদের সবচেয়ে বেশি মস্তিষ্ক বিকাশ হয় এবং সেই মতো বিভিন্ন বয়সে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে[১]। যেমন--

(ক) ভাষা শিক্ষা-- জন্ম থেকে ছয় বছর (খ) ছোটো ছোটো জিনিসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ-- ১৮ মাস থেকে ৩ বছর (গ) বিন্যাস--১ থেকে ৩ বছর (ঘ) ইন্দ্রিয় সচেতনতা বৃদ্ধি-- জন্ম থেকে ৪ বছর (ঙ) সামাজিক ব্যবহার-- আড়াই থেকে ৪ বছর।

কাজেই এই বয়সের শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি (২০১০) ইংল্যান্ডে Effective Preschool and Primary Education (EPPE) Project-এ প্রায় তিন হাজার শিশুর ওপর সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা চালিয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন[২]—

(১) প্রি-স্কুলে পড়লে শিশু বিকাশের সহায়ক হয় (২) প্রি-স্কুলে ফুলটাইম ও পার্টটাইম উপস্থিতির মধ্যে কোনও তফাৎ নেই (৩) সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা যথাযথ প্রি-স্কুলে তুলনামূলকভাবে বেশি উপকৃত হয় (৪) প্রি-স্কুলের গুণগত মানের ওপর শিশুদের বিকাশের মান অনেকটাই নির্ভরশীল (৫) বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশের ওপরেও শিশুদের বিকাশ নির্ভর করে (৬) শিশুদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব অনেকটাই কমে প্রি-স্কুলে পড়াশোনা করলে।

২০১১ সালে OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ৬৫টি দেশের শিশু শিক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যেসব

এরপর ৪ পাতায়

অঙ্কন: মোহনলাল মুখার্জি

এক কুয়াশা থেকে আরেক কুয়াশায়

একরাম আলি

ভোর কখন হয়? অন্ধকার ফিকে হলে? নাকি ঝিরঝিরে কুয়াশা নেমে ঠান্ডায় জমাট বেঁধে চারদিক আবছা করে দিলে? ওই যে সরু মোরাম রাস্তা এঁকেবেঁকে একটু গিয়েই হারিয়ে গেছে কুয়াশার ভেতর, ওই রাস্তা দিয়ে কে যেন আসছে কুয়াশা ফুঁড়ে? কেউ না, অনন্ত আসছে। ওকে চেনা যাবে না। শীত ওকে কুঁকড়ে, বাঁকিয়ে, ছেঁড়া চাদরের আচ্ছাদনে এইটুকু করে দিয়েছে। কোনও মতে বাঁ-হাতটা বের করে মুখে ধরে আছে বিড়ির শেষটুকু। আসলে একটুকরো আগুন, তার ওম।

সে চলেছে ধান কাটতে। কাস্তে? আছে ডানহাতে, ঠান্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যে-হাতটি চাদরের তলায় লুকোনো। ডোমপাড়ার কুয়াশা থেকে বেরিয়ে সে ঢুকে পড়ল বিশাল ধানখেতের ঘন কুয়াশায়।

সেই কুয়াশার শেষে, ধানখেতের ওপারে, মাইল দুই দূরে গঞ্জ। পাকা রাস্তা। স্কুলবাড়ি। সরকারি অফিস। পার্টি অফিস। কয়েকটা মোড়। স্কুলমোড়ের মাথায় আগুন পোহাচ্ছে জংলা আর বাহাদুর, আর দুটো কুকুর। পাশের দোকানে নিখিল উনুনে আঁচ দিচ্ছে। আঁচ উঠলে চায়ের জল বসবে। সারা দিনের হাজার কাপ চায়ের প্রথম দু'কাপ। বাজারে ওরা নাইটডিউটিতে ছিল। চা খেয়ে বাড়ি যাবে। ঘুমোবে।

স্কুলমোড় থেকে রাস্তা চলে গেছে বোলপুরের দিকে। যায়নি, একটু গিয়েই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কুয়াশায়।

শীতকালের ভোরবেলা দুনিয়াটা কুয়াশা দিয়ে মোড়া। বোলপুর থেকে নোয়াদার ঢাল। সেখান থেকে বর্ধমান। দেবীপুর। ব্যান্ডেল। শেওড়াফুলি। একেবারে দোরগোড়া পর্যন্ত -- যার নাম বালি। আদিগন্ত চাদর। ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে ফাঁকা মাঠে ট্রেন থমকে যায়, মাথা নিচু করে এক'পা-দু'পা করে চলে কুয়াশার ভেতর। যাত্রীরা কথা বললে মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে আসে, তাও কুয়াশা! বাচ্চারা মজা পায়। বড়রাও। দু'দলের দু'রকম মজা।

শীত যে কত রকমের, সমাজের স্তরভেদে তার রূপ যে কত আলাদা, কত যে কষ্ট আর কত যে আনন্দ -- যারা জানে, তারাই জানে।

ওই যে একফোঁটা জল জানলার শার্সির এপাশে টলতে টলতে নেমে আসছে রেখা হয়ে, কাজের মেয়ে দত্তাবাদের আরতি জানে -- অশ্রু নয়, নেমে আসছে শিশির। কুয়াশার জলীয় রূপ।

শীতে কান্না আসে না। কষ্টে শুধু চোয়াল শক্ত হয়। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতেও হাঁটুদুটো শক্ত রাখতে হয়। না হলে বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না।

দলছুট একটা ঘুঘু কোত্থেকে এসে ফুটপাথ খুঁটছিল। আরতির পায়ের শব্দে উড়ে... আরে, কোথায় হারিয়ে গেল!

কোথায় আবার, কুয়াশায়! ওই কুয়াশার ভেতরই তো রয়েছে শীতের কল্পতরু বৃক্ষটি।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের চিকিৎসা পরিষেবায় 'প্ল্যানেট ক্যুয়র'

উৎপল ঘোষ

সুদূর ফ্রান্সের 'সাইনোপলিস' শহরে অবস্থিত এক বিশ্ব মানব কল্যাণ সংস্থা ''প্ল্যানেট ক্যুয়র'' (Planete coeur)। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি NGO-কে স্বাস্থ্য পরিষেবা তথা জনসেবার জন্য নিয়মিত অনুদান দিয়ে থাকে।

ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির এক অন্যতম সদস্যা জেনিন ওয়ালটার (Jenine Walter) প্রতি বছরেই কলকাতায় আসতেন মাদার টেরিজার নির্মল হৃদয়ের পরিদর্শনে একজন সক্রিয় সদস্যা হিসেবে। ওই সময় থেকেই সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতার নাতি শ্রীঅরূপ ঘোষ মহাশয়েরও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল মাদার টেরিজার নির্মল হৃদয়ের সঙ্গে।

১৯৯৪ সালে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে শ্রীঅরূপ ঘোষ জেনিন ওয়ালটারের সাথে যোগাযোগ করে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বিভিন্ন জনকল্যাণকর পরিষেবা পরিদর্শনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। সঙ্ঘের দাতব্য অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের প্রক্রিয়া দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সংগঠন থেকে সাম্ভাব্য সাহায্যের আশ্বাস দেন। এবং পরের বছর, ১৯৯৫ সাল থেকেই 'প্ল্যানেট ক্যুয়র' সঙ্ঘের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য বার্ষিক অনুদান পাঠানো শুরু করে। প্রথম কয়েক বছর তাঁদের অনুদানের পরিমাণ ছিল এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়)। পরবর্তী সময়ে জেনিন

বাঁদিকে প্ল্যানেট ক্যুয়রের প্রেসিডেন্ট ডঃ পিয়েরে ভেরউস্ট। ডানদিকে সঙ্ঘের সভ্যদের মাঝে। ছবি: অভিক গুহঠাকুরতা।

ওয়ালটার ছাড়াও প্ল্যানেট ক্যুয়র থেকে অন্য সদস্যরাও সঙ্ঘের পরিষেবা পরিদর্শনে এসেছেন। যেমন মোনিক সিফারড (Monique Chifferd) এসেছিলেন ১৯৯৮ সালে। তিনি সঙ্ঘের দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর প্রকল্পের উদ্যোগ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

২০০০ সালে পরিদর্শনে আসেন ওই সংস্থার সম্পাদিকা মঁরিয়া ফসে (Maria Fauche)। তিনি চিকিৎসা বিভাগে দুঃস্থ ও আর্ত রোগীদের অবস্থা দেখে বিষণ্ণ হৃদয়ে আপীল করেন আরও ভালো সেবা দেওয়ার। এরপর থেকে তাঁরই উদ্যোগে অনুদানের পরিমাণ বেড়ে গড়ে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকায় পৌঁছয়।

ইদানিং সঙ্ঘ পরিদর্শনে আসছেন ওই সংস্থারই প্রেসিডেন্ট ডঃ পিয়েরে ভেরউস্ট (Dr. Pierre Verroust)।

তিনি সম্প্রতি আমাদের দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ, বহির্বিভাগের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করেন। এবং উপস্থিত ডাক্তারদের সঙ্গে নানান বিষয়ে পরামর্শ করেন, নির্মিত হতে চলা গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত রাখেন।

ওই সংস্থার সকল বিদেশি প্রতিনিধিরাই আসলে মানব দরদী ও সহৃদয়। বিশেষ করে জেনিন ওয়ালটার আন্তরিকভাবেই কলকাতা ও বাঙালিপ্রেমী। সাধারণত এঁরা সকলেই কলকাতায় এলে থাকেন গুহঠাকুরতা পরিবারের উষ্ণ আতিথেয়তায়।

ছয়-সাত বছর ধরে প্ল্যানেট ক্যুয়রের প্রেরিত অনুদানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায়। এখনও পর্যন্ত ওই সংস্থার প্রেরিত অনুদানের মোট পরিমাণ হবে ৩১ লক্ষ টাকারও বেশি।

স্বর্গীয় মাণিক্যবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রী প্রবীর গুহঠাকুরতা মহাশয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। প্রতি বছরেই গান্ধী সেবা সঙ্ঘের চিকিৎসা-সংক্রান্ত আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠানো হয় প্ল্যানেট ক্যুয়রের প্রধান কার্যালয়ে।

প্ল্যানেট ক্যুয়রের এই ধারাবাহিক অর্থ সাহায্যের ফলে আমাদের চিকিৎসা বিভাগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

চক্ষুবিভাগ ও ইসিজি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নতুন করে ক্রয় করা হচ্ছে। নিয়মিত ওষুধ সরবরাহের পরিমাণও বেড়েছে।

আমরা সঙ্ঘের সকল সদস্যরা আন্তরিকভাবেই কৃতজ্ঞ ওই বিদেশি সংস্থার প্রতি। এবং অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে উল্লেখ করতেই হবে শ্রী প্রবীরবাবু ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জবা গুহঠাকুরতার এই নিরলস ও আন্তরিক পরিশ্রমকে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘে শিশুবিকাশ কেন্দ্র

জবা গুহঠাকুরতা

গান্ধীজির আদর্শে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ম ধরে একটি পাঠশালা দিয়েই গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পথ চলা শুরু। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই শিশুদের কথা ভেবেছে। ১৯৪৬ সালে দক্ষিণদাড়ির পাথর কলের কাছে একটি বাড়িতে কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালাটি তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সেটি বর্তমানের স্কুলবাড়িতে উঠে আসে। প্রায় ৭০ বছর আগে যাঁরা এই পাঠশালাটি তৈরি করেছিলেন শিশুদের প্রতি ভালোবাসার তাগিদে তাঁরা আজ কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু সঙ্ঘ সব সময়ই ছোটোদের কথা ভেবে আঁকার ক্লাস, নাচ ও গানের ক্লাস, আবৃত্তি শেখানোর ক্লাসও চালিয়ে চলেছেন। ছোটোদের পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু সৃজনশীল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে শিশুদের মনোবিকাশ সম্পূর্ণ হতে পারে সেই প্রচেষ্টাতেই আমাদের শিশুবিকাশ কেন্দ্রের সৃষ্টি।

এক সময় Lake Gardens Lions Club-এর মাধ্যমে ছোটোদের জন্য Toy Library আরম্ভ করা হয়েছিল। বছর তিনেক ভালো চলেছিল। সঙ্ঘে Karate Class, Roller Skating Class নিয়মিত ভাবে চলে। রবিবার সকালে আঁকার ক্লাসটিতে এখন প্রায় ৪২ জন ছাত্রছাত্রী আছে। কিছুদিন আগেই শিশুদের মধ্যে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা করা হয়।

সঙ্ঘ গ্রন্থাগারেও একটি শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে। বেশ কিছু নামীদামী বইও সেখানে আছে। বর্তমানে কিছু কিশোর কিশোরী নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসছে। এখানে বসে বই ও পত্রপত্রিকা ঘাটাঘাঁটি করে কিছু গল্পস্বল্পও করে। ছোটোদের কলকাকলি সবারই ভালো লাগে। বাড়ির বড়রা যদি সঙ্গে করে মাঝেমাঝে ছোটোদের নিয়ে গ্রন্থাগারে আসেন তাহলে বোধহয় বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি বা সখ্যতা খুব ছোটো থেকেই হতে পারে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ হাসপাতাল

গৌতম সাহা

নানা কারণে পূর্ব ঘোষিত দিন ২রা অক্টোবর ২০১৫-তে হাসপাতাল উদ্বোধন সম্ভব হয়নি। যদিও সঙ্ঘভবনে হাসপাতালের বহির্বিভাগে বিভিন্ন শাখায় ৩০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রবিবার ও ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১টা এবং বিকেল ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত রোগী দেখছেন। রোগীদের নানান পরীক্ষার জন্য বিশেষ আর্থিক ছাড়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আনন্দের বিষয় হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে নতুন হাসপাতাল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৬-র জানুয়ারি মাসের মধ্যেই হাসপাতালের নিজস্ব ভবনে রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগারসহ বহির্বিভাগটি শুরু করবার জন্য সর্বতভাবে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।

সেবামূলক এই হাসপাতাল প্রকল্পটির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কোনও ব্যাঙ্ক লোন নয়। জনসাধারণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং সাংসদ ও বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকেই হাসপাতাল গঠনের মূল টাকা জোগাড় করা হচ্ছে।

আপনারাও এগিয়ে আসুন। জনকল্যাণমূলক এই উদ্যোগকে সার্থক রূপ দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। দান করুন, স্বেচ্ছাশ্রমের মানসিকতায় এগিয়ে আসুন।

আপনার সমস্তরকম আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ৮০-জি ধারায় কর মুক্ত।

যোগাযোগ: গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল প্রকল্প দপ্তর। সঙ্ঘের ২তলা।

ফোন: গৌতম সাহা-৯৪৩২০০০২৬০

মেল: gsshospitalkolkata@gmail.com

সংঘ সংবাদ

১) গত ২রা অক্টোবর সদস্যরা মিলিত হয়ে গান্ধীজির জন্মদিন উদযাপন করা হয়। সেদিন শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুরা সকলে জমায়েত হয়েছিল। অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মিষ্টি, লজেন্স পেয়ে তারা খুব খুশি হয়েছিল।

২) ৪ঠা অক্টোবর সকালে Lions Club-এর উদ্যোগে প্রায় ২০০ জন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ব্যাগ, টিফিন বক্স, জলের বোতল, খাতা, পেন্সিল, মিষ্টির বাক্স বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘের মাণিক্যমঞ্চে প্রায় ৪/৫ ঘন্টা ধরে এই বিশাল অনুষ্ঠানটি সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

৩) গত ১লা নভেম্বর রবিবার 'ইকো' পরিচালিত বিজয়া সম্মেলনী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকী আড্ডার মেজাজে এবং সুললিত সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা হয়। অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী হয়েছিল।

৪) গত ৭ই নভেম্বর কলকাতার সর্বত্রই ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্য নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আর জি কর মেডিকাল কলেজের অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ সুবীর গাঙ্গুলির আহ্বানে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের তরফ থেকে বেশ কয়েকজন সদস্য শ্যামবাজারে আর জি কর মেডিকাল কলেজে যান। একটি বিশাল পদযাত্রার আয়োজন সেখানে হয়েছিল। ডাক্তারি ছাত্রছাত্রী, নানা স্কুলের ছাত্রী, ডাক্তারবাবু, নার্সরা -- সকলেই সামিল ছিলেন এই পদযাত্রায়।

সামান্য হলেও গান্ধী সেবা সঙ্ঘ ক্যানসার সচেতনতা নিয়ে কিছু সেমিনার, আলোচনাসভা মাঝেমাঝে আয়োজন করেছে। ডঃ সুবীর গাঙ্গুলী সঙ্ঘের 'সেবা নিবাসের' উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন। এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পেরে আমাদের ভালো লেগেছে।

ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার ক্যালকাটা, লেকটাউন

চিত্রা রায়

সিলিন্ডার ফেটে দাউ দাউ করে আগুনে ধ্বংসের ছবি। ইনসেটে ইনার হুইলের সদস্যারা। ছবি: প্রতিবেদক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা 'সেবক'-এর সৌজন্যে গত জুলাই মাসে এই অঞ্চলের বহু মানুষের কাছে আমাদের এই ক্লাবটিকে বেশ খানিকটা পরিচয় করাতে পেরেছিলাম, নারীশক্তি চালিত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, 'ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার ক্যালকাটা, লেকটাউন'-এর।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য -- এই তিনটি মন্ত্রই আমাদের ক্লাবের কাজের মূল আঙ্গিক। সেই পরিসরকে হৃদয়ে নিবিড় করে নিয়ে আমাদের ক্লাব নিরলস কাজ করে চলেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্নভাবে। সম্প্রতি আমাদের সদস্যরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আগুনে পুড়ে যাওয়া বস্তির কিছু বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে।

ঘটনাটা গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে। অন্যান্য দিনের মতই কাজ চলছিল ফড়িয়াপুকুর বস্তি সংলগ্ন একটি গ্যারাজে। অজানা, অনিশ্চিত কারণেই সিলিন্ডার ফেটে দাউ দাউ করে আগুন লেগে যায় গ্যারাজে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই লেলিহান সেই অগ্নিশিখা গ্রাস করে ফেলে ওই গ্যারাজ সংলগ্ন এলাকার বস্তিগুলিকে। ক্ষয়-ক্ষতি অপরিসীম হলেও, মানুষজনের প্রাণহানি ঘটেনি। তাঁরা সময়মত নিজেদেরকে অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অতিকষ্টে সংগ্রহ করা তাঁদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই নির্মম অগ্নিকাণ্ডে।

রাজ্যজুড়ে এই খবরে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে যায় 'ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার ক্যালকাটা, লেকটাউনে'র সদস্যরা তাঁদের মৌলিক তাগিদ থেকেই। ক্লাবের মহিলা সদস্যারা হাত বাড়িয়ে দেন ওই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে। সেদিনই শেষ নয়! পরের দিন সাধ্যমত জামাকাপড় বিতরণ করতে করতেই জানা যায় ওই ভয়াবহ আগুনে নিস্তার পায়নি বেশ কিছু পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে বইখাতা ও স্কুল ইউনিফর্ম পর্যন্ত। সবই হারিয়েছে আগুনের গর্ভে।

১৫ সেপ্টেম্বর আবারও আমাদের ক্লাবের সদস্যরা যান যদু মিত্র লেন, ফড়িয়াপুকুরের ওই বস্তিবাসীদের কাছে। সেদিন বিতরণ করা হয় খাবার, প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, ছাত্রছাত্রীদের বইখাতা, স্কুল ইউনিফর্ম ও জুতো।

'আমরা পাশে আছি এরকম যে কোনও প্রয়োজনে' -- এই আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তখনকার মত ফিরে এলেও 'ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার ক্যালকাটা, লেকটাউন'-এর সদস্যরা অঙ্গিকারবদ্ধ সমাজের অসংখ্য বিপন্ন মানুষের বিপদে-আপদে সদাই জাগ্রত থাকবে। রাজ্যজুড়ে আমাদের এই ক্রিয়াকলাপের সাথী হতে, বিপন্ন, নিরাশ্রয় মানুষের মনে এই আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে আমাদের প্রয়োজন সমাজের জাগ্রত, বিবেকবান সকল শ্রেণীর মানুষের সাহায্য। ভরসা রাখতে পারি এই ধরনের কাজে আমাদের গতিশীল রাখতে পত্রিকা 'সেবক'-এর মাধ্যমে জাগ্রত বিপুল জনগণ আমাদের কখনোই নিরাশ করবেন না। চলার পথে আমরাও নিরাশ হব না।

সময়টা এখনও উৎসবমুখর। তাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল সকলের জন্য আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে।

যোগাযোগ: ৯৮৩৬০৭৬৬১১

স্মরণে

ডঃ শম্ভুনাথ চক্রবর্তী। ১০৫ এস কে দেব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৮। জন্ম: ০১-০১-১৯৫০ আর মৃত্যু ১৩-১০-২০১৫। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ পাস করে নাট্য সাহিত্যে ডক্টরেট করেন। শিক্ষকতার সাথে সাথে আকাশবাণীতে পার্ট টাইম সংবাদ পাঠক ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। 'সেবক' পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। নাটক ছিল তাঁর প্রাণ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও এক কন্যাকে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

amantran

Exquisite Caterer

amantran

HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING

P-132, LAKE TOWN, BLOCK-A, KOLKATA-700 089
P-2521 3554/2534 9879/2534 6653
M-98300 49738

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
আয়োজিত
লেকটাউন মুক্তমঞ্চে ধারাবাহিক নাট্যপ্রদর্শন
প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ
চলছে ● চলবে
নাটক দেখুন
নাটক করুন
ইকো নাট্যোৎসব ২০১৬
৭ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১৬
স্থান: মাণিক্য মঞ্চ (গান্ধী সেবা সঙ্ঘ) প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
সবার আমন্ত্রণ
উৎসবে নতুন প্রযোজনার কাজ চলছে
আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা যোগাযোগ করুন
নির্মল শিকদার- ৯৮৩০০৪৯৭৩৮

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
Leader in Solar PV Engineering
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

সেবক

২৭ কার্তিক ১৪২২ ● শনিবার ১৪ নভেম্বর ২০১৫

সেবাতে নাহি কোনও অসহিষ্ণুতা

রাজস্থানের আলওয়ারের লক্ষ্মীনগরের এক সরকারি স্কুলে অঙ্ক শেখান ৩৭ বছর বয়সী ইমরান। ইমরান খান। শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন ১৯৯৯ সালে। পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন ইমরান। বিষয় ছিল কিশোর-কিশোরীদের কাছে সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরকে জলবৎ তরলং করে দেওয়া। ভাইয়ের ফেলে যাওয়া আইটি-র বইগুলি পড়ে পড়েই সফটওয়্যার ডেভেলপ করার পরিকল্পনা! আর? আর, গুগল তো ছিলই পাশে। ব্রিটেনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা করছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র পথিকৃৎ তো হতেই পারেন ইমরান! ইমরান খান। ততদিনে ইমরান তৈরি করে ফেলেছেন ৫০টির-ও বেশি শিক্ষামূলক অ্যাপস। ইমরানের শিক্ষামূলক অ্যাপসগুলি দেশ-বিদেশের ৩০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই ডাউনলোড করে ফেলেছে। যাতে রয়েছে বিজ্ঞান, কোনওটিতে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর। জটিল গুণাঙ্ক সমাধানের সাধারণ প্রক্রিয়া। যা মুখে মুখেই সমাধান করতে পারে পড়ুয়া বালক-বালিকারা। ভীতি-ময় সাবজেক্ট 'অঙ্ক'কে সরলীকৃত করে ভালোবাসার তাগিদ তৈরির মধ্যে দিয়েই ইমরানের অ্যাপসের সফলতা। তাতেই গুগল উৎসাহিত। সেবাই ধর্ম, সেবাই কর্ম, সেবাতে নাহি কোনও অসহিষ্ণুতা! এ তো আপেক্ষিক নহে! এ যে মানব জীবনের মৌলিক তাগিদ।

শিশু শিক্ষা ও প্রযত্ন

১ পাতার পর

দেশে বেশি সংখ্যক শিশুরা যথাযোগ্য প্রি-স্কুলে যায় সেই সব দেশে ১৫ বছর বয়সে শিক্ষাগত মান অনেক উন্নত হয়। এর ফলে ওই সব দেশের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অনেক উন্নতি হয়[৩]।

মারিয়া মন্তেসরি

মারিয়া মন্তেসরির অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর যে কটি দেশে শিশুশিক্ষা ও প্রযত্নের ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় তার মধ্যে ইউরোপের নর্ডিক দেশগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ফিনল্যান্ড সর্বাগ্রগণ্য। তাই ফিনল্যান্ডের শিশুবিকাশের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হল।

ফিনল্যান্ডে শিশু শিক্ষার নীতি ও রীতি নির্ধারণ করার জন্য প্রাক্‌শৈশব শিক্ষা ও প্রযত্নর (Early Childhood Education and Care--ECEC) বিষয়ে একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম ও নির্দেশিকা ২০০৩ সালে তৈরি হয়[৪]। এই ECEC-র মধ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় স্তরের আইন এবং বিধিনির্দেশ আছে। এমনকি একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেও প্রয়োজনীয় বিধিনির্দেশ আছে। শিশুদের মৌলিক অধিকারবোধ এবং শ্রেষ্ঠ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ECEC-র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাতে দেশের প্রত্যেকটি শিশু সারা জীবন সত্যিকারের মানুষ হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়, নিজের উন্নতি ও স্বনির্ভরতার সাথে সাথে অন্যদের প্রতি সামাজিক কর্তব্য ও সহনশীলতার সদভ্যাস তৈরি হয়। এর জন্য প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সব প্রি-স্কুল এবং ডে-কেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন তাঁদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় যাতে তাঁরা প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহারের দিকে যথাযথ খেয়াল রাখেন এবং গুরুত্বসহকারে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। প্রি-স্কুলগুলোর পরিবেশ শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষক হতে হবে এবং শিশুরাও চাইলে তার পরিবর্তন করতে পারবে।

শিশুশিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বিভিন্ন শারীরিক কার্যকলাপ। এর ফলে শিশুদের শরীর সুস্থ ও সবল হয় এবং ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের ক্ষমতা বাড়ে। নানারকম শারীরিক প্রক্রিয়ায় শিশুদের আনন্দদান করা ও বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শরীরকে সতেজ, সুস্থ ও সবল করা শিশুশিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। নাচ, গান, সাঁতার, আসন ইত্যাদি শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা শিশুশিক্ষকদের অবশ্য কর্তব্য।

শিশুশিক্ষার বিষয় নির্বাচন এবং তাঁর পঠনপাঠনের ভঙ্গিমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিনল্যান্ডে ECEC প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের ওপর ঝোঁক থাকে।

(ক) গাণিতিক, (খ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (গ) ঐতিহাসিক-- সামাজিক, (ঘ) নান্দনিক, (ঙ) নৈতিক এবং (চ) দার্শনিক।

শিশুদের এই সমস্ত বিষয়ে পড়াশোনা বা জানার কোনও দরকার নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় জানতে বা বুঝতে গেলে যে দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা শিশুদের অর্জন করতে হবে সেদিকেই শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে। যে শিশুর যেদিকে বেশি ঝোঁক দেখা যাবে তাকে সেইদিকেই যথাযথ পরিচালনা করতে হবে।

ফিনল্যান্ডে ECEC-র নির্দেশিকানুযায়ী শিশুদের পিতা-মাতার সহযোগিতা শিক্ষায় অত্যন্ত সক্রিয়। পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন -- আলোচনা, সৃজনশীলতা, গুণগত বিচার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তাঁদের মতামত দিতে এবং নিতে হয়। বস্তুত ECEC-র মূল নীতির দৃষ্টিকোণে শিশুশিক্ষা ও প্রযত্নের চারটি স্তম্ভ হচ্ছে: সমাজ, শিশু, পিতামাতা এবং শিক্ষা।

ইংল্যান্ডের Daycare বা Kindergarten (KG) কেন্দ্রগুলো প্রথম থেকে ছয় বছরের শিশুদের জন্য এবং প্রি-স্কুল কেন্দ্রগুলো ছয় থেকে সাত বছরের শিশুদের জন্য। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলোই প্রধানত স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। সাত বছর থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় এবং সমস্ত স্কুলই এলাকাভিত্তিক মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনও এলাকার শিশুদের ওই এলাকারই কেজি বা প্রি-স্কুল এবং পরবর্তিকালে স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। প্রি-স্কুল এবং স্কুল শিক্ষা পুরোপুরি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। শিশুদের ডে-কেয়ার বা কেজি-তে পাঠানো বাধ্যতামূলক নয়, যদিও বেশির ভাগ শিশুরাই মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত কেজি-তে শিক্ষালাভ করে। কোনও বাবা-মা যদি তাঁদের শিশুকে বাড়িতে রেখে শিক্ষা দিতে চান, তবে তাকে ECEC-র নির্দেশিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। এর জন্য সরকার থেকে তাদের মাসোহারারও বন্দোবস্ত আছে।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, ফিনল্যান্ড বা ইউরোপ বা আমেরিকার মত দেশে যে ধরনের শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা চলছে তা পুরোপুরি আমাদের মত দেশে চালু করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু যে মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুশিক্ষার অভিমুখ ফিনল্যান্ড বা অন্যান্য উন্নত দেশে প্রবর্তিত হয়েছে -- তা অবশ্যই আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের মত বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে শিশুশিক্ষার সঠিক অভিমুখ ও দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও সর্বভারতীয় জাতীয় নীতি গৃহীত এবং প্রবর্তিত হয়নি।

(১) Paula Polk Lillard, Montessari today: A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood, Knopf Doubleday Publishing Group, ISBN 978-0-307-76132-3 (2013), pp. 118-140.

(২) Reasearch on Early childhood Education in UK, Edward Melhuish, Science, (333), 299300 Effective Preschool & Primary Education (EPPE)

(৩) OECD (2011). Pisa in Focus 2011/1: Does participation in pre-primary education translate into better learning outcomes at school?

(৪) National Curriculum Guidelines on early childhood Education and Care in Finland, Anna-Leena Valimaki and Pair Lindberg, August 2004.

(৫) Jaakko Pelli, Finland (Pvt. Communication)

শিশু শিক্ষা ও সরকারের কিছু প্রকল্প

শঙ্করলাল ঘোষাল

স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক চারটি প্রয়োজন যথা: খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত প্রকল্পগুলি যাতে সমস্ত নাগরিকের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ আজও দারিদ্রসীমার নিচেই রয়ে গেছেন। আমার মনে হয়, এই অবস্থায় উন্নতি করতে গেলে সবচেয়ে প্রয়োজন শিশুশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া। প্রয়োজন উন্নতমানের ব্যবস্থা অতি দ্রুত চালু করার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের অভাবে অনেক সরকারি প্রকল্পই পূর্ণাঙ্গরূপে সার্থকতা লাভ করছে না। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারিগুলিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অচিরেই পালন করতে হবে। আমাদের মত সাধারণ নাগরিকদেরও সচেতনার প্রয়োজন। প্রধান পাঁচটি সরকারি প্রকল্প এখানে খানিকটা বিশদে উল্লেখ করলাম:

১। শিক্ষা সহযোগ যোজনা: এই প্রকল্পে যেসব ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা দারিদ্রসীমার নিচে কিংবা সামান্য ওপরে আছেন, তাঁদের সন্তানরা প্রাথমিক পড়াশোনার জন্য বৃত্তি পাবে।

২। সর্বশিক্ষা অভিযান: এই প্রকল্প ভারতের সব জেলাতেই শুরু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা সেই সমস্ত শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে, তাদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া।

৩। কন্যা স্বাক্ষরতা যোজনা: এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যাতে ট্রাইবাল ছাত্রীরা না চলে যায় এবং তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ছাত্রী যারা ক্লাস-VI অবধি পড়াশোনা করবে তারা মাসে ৫০০ টাকা করে পাবে। যারা ক্লাস-IX-এ ভর্তি হবে তারা ১০০০ টাকা করে পাবে। আর যারা ক্লাস-XI-এ ভর্তি হবে তারা পাবে ২০০০ টাকা করে।

৪। কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা: এর উদ্দেশ্য মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখানে ক্লাস-V থেকে ক্লাস-VIII পর্যন্ত ছাত্রীদের হস্টেলের ব্যবস্থা আছে। প্রায় ৩৫০০ স্কুল এই প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত আছে বলে জানা যায়।

৫। মিড-ডে মিল প্রকল্প: এই প্রকল্পটি অনেকটাই সার্থকতা লাভ করেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এই প্রকল্পের জন্য শিশুদের ইস্কুলে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আরও বেশি। ইস্কুল ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাও অনেকটাই কমে গেছে। একটি 'পাবলিক রিপোর্ট অন বেসিক এডুকেশন' বলছে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওই রিপোর্টে দেখা গেছে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষের সন্তান-সন্ততিরা ইস্কুলে গেলে নিয়মিত মিড-ডে মিল পাচ্ছে। নানান দিনে নানান ধরনের খাবার সেখানে দেওয়া হয়ে চলেছে। এর ফলে খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার অভ্যাসও তাদের গড়ে উঠেছে। যদিও মাঝেমাঝেই খাওয়ার মান নিয়ে কোথাও কোথাও অভিযোগ শোনা যায়। তবুও এই প্রকল্পের সফলতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পরিশেষে আশা রাখি, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রতিটি রাজ্য সরকার ও সমাজের সমস্ত স্তরের সংবেদনশীল সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকদের অন্যান্য ও উপরোক্ত এইরূপ প্রকল্পগুলিকে সার্থক করার জন্য সমস্তরকম সহযোগিতা করতেই হবে আমাগী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।

চিলকিগড়ের দুই রাজকুমার

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার পুরনো রাজা মহারাজদের ওপর একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি ম্যাগাজিনে লিখব বলে তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ চষে বেড়াচ্ছি। ঝাড়গ্রামের দুই কুমার (অবশ্যই প্রাক্তন, কারণ রাজা ও রাজত্ব দুটি আইন মোতাবেক লুপ্ত)-এর সঙ্গে দেখা হল। রাজবাড়ির একটা অংশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ। কুমাররা থাকেন দোতালায়। শহরে বড় কুমারের পেট্রল পাম্প। ছোট কুমার ঠিক কি করতেন আজ আর মনে নেই।

এরপর গেলাম লালগড়, এই সেদিন পর্যন্ত যে লালগড় মাওবাদী সন্ত্রাসে তোলপাড় হচ্ছিল। আমি গিয়েছিলাম তার ঢের আগে। তখন কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই। মেদিনীপুর শহরের অদূরেই এই লালগড়ে তখন পূর্ণ শান্তি। লালগড়ে ঢুকে ড্রাইভারকে একটা চায়ের দোকানের সামনে থামিয়ে, দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই রাজবাড়িটা কোথায়? খদ্দেরের জন্য চা ছাঁকতে ছাঁকতে জবাব দিলেন, 'ওই যে বড় দোতলা বাড়িটা দেখছেন, রাস্তার বাঁ ধারে, ওটাই রাজবাড়ি। তা কার সঙ্গে দেখা করবেন?' বললাম আপনারা যাকে রাজা বলেন তাঁর সঙ্গে। 'ও, তাহলে আর দেরি করবেন না। এখনই বাজে সাড়ে ন'টা। বড় রাজকুমার ১০টা না হতেই বেরিয়ে যাবেন। সাড়ে দশটায় ওর স্কুল বসে।' তা মাস্টারমশাই বড় রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি, বাড়ির বারান্দায় বেদীতে বসে গামছা পরে একজন মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক হালকা শীতে পিঠ সেঁকতে সেঁকতে সরষের তেল মাখছেন। আমি আর আমার সহকর্মী ফোটোগ্রাফার অশোক বসু (বর্তমানে প্রয়াত) সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, চোখের ইশারায় জানতে চাইলেন, 'কি চাই? কাকে চাই?'

বললাম কলকাতা থেকে এসেছি। ম্যাগাজিনের নাম উল্লেখ করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললাম, রাজার একটা ইন্টারভিউ চাই। তেল মাখতে মাখতে বললেন নিরুত্তাপ গলায়, 'রাজাও নেই, রাজত্বও নেই। থাকলে আমিই হতাম রাজা বা বড় রাজকুমার। এখন স্কুলে পড়াই। ফার্স্ট ক্লাস সাড়ে দশটায়। স্নান করে, দুটো ভাত খেয়েই সাইকেলে বেরিয়ে পড়ব। চার কিলোমিটার দূরে স্কুল। বিকালে আসুন তখন কথা হবে।'

সেদিন বিকেলে লালগড়ের মুকুটহীন রাজার ইন্টারভিউ শেষ করে পরের দিন সকালেই রওনা দিলাম চিলকিগড়ের দিকে। দুপুরের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। হ্যাঁ, দেখে মনে হল সত্যিই একসময় রাজবাড়ি ছিল। বিশাল ভাঙ্গা সিংদরজার একটা পাল্লা পাঁচিলের মরচে পড়া কব্জার গায়ে লেপটে রয়েছে। অন্য পাল্লাটা নেই। দু মানুষ উঁচু যে পাঁচিল ছিল তা দরজার দু পাশের যে অংশুটুকু অবশিষ্ট আছে তা দেখে মালুম হল। পাঁচিলের ১৫ আনাই সাফ হয়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় পুরনো পাতলা ইঁটের ডাঁই। দূরে দোতলা রাজবাড়ি দেখতে পাচ্ছি। সিংদরজা আর রাজবাড়ির মধ্যে যে জমিটা পড়ে আছে তাতে ইলেভেন-এ সাইড ফুটবল মাঠ অনায়াসে বানানো যায়। গোটা দুই চার ছাগল চড়ছে। আর রাজবাড়ির বারান্দায় দেখি হাফপ্যান্ট পরা একটি বালক বসে পা নাচাচ্ছে। গাড়িটা সিংদরজার বাইরে রেখে সোজা চলে গেলাম ওই ছেলেটির কাছে। বাড়িতে কেউ আছে? -- জানতে চাইলে পা নাচাতে নাচাতে ডান হাতের তর্জনি দোতলার দিকে তাক করে ইঙ্গিত করল ওই খানে। ওঠার সিঁড়ি কোথায়? এবার ওই লম্বা টানা বারান্দার, যার গায়ে পর পর তালাবন্দী ঘর, শেষ যেখানে সেদিকে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেখাল সিঁড়ি।

দিনের বেলা বাইরে রোদ্দুর ফটফট করছে। অথচ সিঁড়িটা আধো অন্ধকারে। তবে রীতিমত চওড়া প্রতিটি ধাপ। জায়গায় জায়গায় পায়রার বর্জ্য লাল সিমেন্টের সিঁড়িকে বেশ ফর্সা করে দিয়েছে। শেষ ধাপে পা দিতেই চোখে পড়ল টানা লম্বা বারান্দা ঠিক একতলার মত। তার শেষ ধারে একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন যে ভদ্রলোক তার মুখ বা সারা দেহ কাগজের আড়ালে। শুধু পা জোড়া দেখতে পেলাম। ওই ইজি চেয়ার থেকে ফুট তিনেক দূরে একটা তোলা উনুনে দেখি ডেকচি চাপানো। পরনে হাফপ্যান্ট, ডান হাতে একটা হাতা, আর এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোক, ডেকচির ঢাকনা তুলে ভেতরের বস্তুগুলি দেখছেন। বস্তুগুলি না দেখেই ছড়িয়ে পড়া গন্ধে টের পেলাম মাংস রান্না হচ্ছে। আমাদের পায়ের আওয়াজে তাকালেন। সামনে গিয়ে পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনাদের ইন্টারভিউ নেব যদি আপত্তি না থাকে! বাংলার প্রাচীন রাজ পরিবারগুলির হাল হদিশ থাকবে এই লেখায়।

> *লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট। শুনতে পেলাম বড় কুমারের গলা, 'যা ভাগ এখান থেকে। এখখুনি দূর হ। আপনারা দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমাদের ব্যবস্থা আছে।*

যার পা-জোড়া দেখেছিলাম, দেখলাম তার পরনে পাজামা, উর্ধ্বাঙ্গে গেঞ্জি। বুঝলাম, চুলের পাক দেখে, বড় কুমার। ছোটভাই গেঞ্জির সঙ্গে হাফপ্যান্টে অন্তত দশ বছরের ছোট। বিশদ পরিচয় পাওয়ার পর বড় কুমার হেসেই বললেন, আপনাদের অফিস ভবানীপুরে সাউথ সুবারবন স্কুলের গলিতে। আমরা থাকি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। মাসে মাসে আসি, দেখতে রাজবাড়িটা আছে কিনা? আর যে ৪/৫ জন স্টাফ আছে তাদের যদি কিছু লাগে তার জন্য। কলকাতার ঠিকানা দিয়ে বললেন, ছবি নিন যত খুশি, ইন্টারভিউ দেব কলকাতায়।

আমরা চলে আসছিলাম। চিলকিগড়ের দুই কুমার ছাড়লেন না। বললেন, 'এসেই যখন পড়েছেন, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চটা না হয় এখানেই সারলেন। ছোট কিন্তু মাংস দারুণ রান্না করে।'

ব্যাজস্তুতি নয়, সত্যিই সেদিন মাংস ছোট কুমার দারুণ রান্না করেছিলেন। সাদা মোটা চালের ভাত, পাঁঠার মাংস, একটা করে লম্বা কাঁচা লঙ্কা রুপোর থালায় সাজিয়ে আমাদের দুজনকে খাওয়ালেন। আমাদের না খাইয়ে নিজেরা কিছুই খাবেন না। কী করব, রাজি হলাম আর ভেতরের ঘরে পুরনো দিনের একটা শ্বেত পাথরের টেবলের দুদিকে চেয়ারে বসে যখন খেতে শুরু করেছি তখন দেখি নিচের বারান্দার সেই বাচ্চা ছেলেটা দুটো রুপোর গ্লাসে জল নিয়ে ঘরে ঢুকে আমাদের দেখে রীতিমত রেগে মেগে মুখ খুলল, 'অ্যাঁ, তোমরা সব খেয়ে নিচ্চো, দাদাবাবুরা খাবে কী?'

লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট। শুনতে পেলাম বড় কুমারের গলা, 'যা ভাগ এখান থেকে। এখখুনি দূর হ। আপনারা দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমাদের ব্যবস্থা আছে। এখন আপনারা না খেলে চিলকিগড়ের অপমান হবে।'

করজোড়ে দুই রাজকুমার আজও আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের চিত্ররূপ

ডঃ শঙ্কর ঘোষ

সাহিত্যের চিত্ররূপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে শুধু বড়দের জন্যে বা সপরিবারে দেখার জন্যেই গল্পেরই চিত্ররূপ তৈরি হয়েছে। একেবারে চল্লিশের দশক থেকেই এই ধাঁচটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এর পাশাপাশি শিশু ও কিশোরদের নিয়ে লেখা সাহিত্যের চিত্ররূপ যে পাইনি এমনটি নয়। সেক্ষেত্রে প্রথম যে ছবিটি আলোড়ন তুলেছিল, সেটি মনোরঞ্জন ঘোষ রচিত 'পরিবর্তন' ছবিটি। ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স-এর প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিটির পরিচালক ছিলেন সত্যেন বসু। একটি আবাসিক স্কুলকে কেন্দ্র করে এই গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ শিশুরাই নবাগত, এক ডানপিটে বালক কিভাবে এক প্রতিবন্ধী বালকের ভালোবাসায় ও সাহচর্যে পরিবর্তিত হয়ে গেল, সেই নিয়ে এক মর্মস্পর্শী আখ্যান 'পরিবর্তন'।

এম পি প্রোডাকশনস-এর ব্যানারে নির্মিত হল এক অসাধারণ ছবি 'বাবলা'। কাহিনীকার সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠী। ১৯৫২ সালে কার্লোভিভ্যারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ ছবি সেরা পুরস্কার পেল। সুতরাং এটি স্মর্তব্য যে 'পথের পাঁচালী'র আগেই বিদেশ থেকে বাংলা ছবি হিসাবে 'বাবলা' পুরস্কৃত হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করতে এগিয়ে এলেন তপন সিংহ। চারুচিত্র ব্যানারে নির্মিত ছবির নাম 'কাবুলিওয়ালা'। ছোট মিনি আর কাবুলিওয়ালাকে কেন্দ্র করে পরিচালক তপন সিংহ যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন তার তুলনা মেলা ভার। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজেকে উজাড় করে দিলেন, পাশাপাশি ছোট মিনিরূপী টিঙ্কু ঠাকুর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বার্লিন ১৯৫৯ চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার বিয়ার পুরস্কারে ভূষিত হল এই 'কাবুলিওয়ালা'।

১৯৫৯ সালে একাধিক ছবি নির্মিত হয়েছে শিশু ও কিশোরদের জন্য। সেই তালিকায় প্রথম ছবি 'লালুভুলু'। ডাঃ নিহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি দুই প্রতিবন্ধী যুবকের গল্প। একজন অন্ধ, অপরজন খোঁড়া। পরিচালক অগ্রদূত। হেমেন্দ্র রায়ের লেখা 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' আর এক স্মরণীয় ছবি। শিবরাম চক্রবর্তীর কাহিনী নিয়ে ঋত্বিক ঘটক তৈরি করলেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিটি। সুধী মহলে ছবিটি বেশ সমাদৃত হয়েছিল। চার্লস ডিকেন্সের কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক বিজলী বরণ সেন নির্মাণ করলেন 'মানিক' ছবিটি। সুরকার ভি. বালসারা। ছবিটি এক সময় দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছিল।

এক দুর্ধর্ষ ডাকাত কিভাবে একটি শিশুর সান্নিধ্যে এসে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল সেই নিয়ে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী 'বাদশা'। পরিচালক অগ্রদূত সেই গল্প নিয়ে তৈরি করলেন সুপার ডুপার হিট ছবি 'বাদশা'। একটি কুকুর, একটি ছাগল ও একটি বাঁদর নিয়ে হরেক কান্ডকারখানা সেই সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি গান -- সময়কেও হার মানিয়েছে।

গুপী বাঘার নানান কাণ্ডকারখানা নিয়ে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী লিখেছিলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। তাকে চিত্ররূপ দিলেন বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায়। তিনি একই সাথে এ ছবির চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার। এ ছবির 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে', 'ভূতের রাজা দিল বর' ও 'মন্ত্রী মশাই ষড়যন্ত্রী মশাই' গানগুলি আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সত্যজিৎ রায় অ্যাডিলেন ১৯৬৯-এ সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেলেন এই ছবির সুবাদে। মেলবোর্ন '৭০-তে এ ছবি পেল শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার, টোকিও '৭০-তে এ ছবি পেল মেরিট পুরস্কার। ইংরাজি 'সাউন্ড অফ মিউজিক' গল্পের চিত্ররূপ দিলেন পরিচালক সুনীল বসুমল্লিক। 'আমাদের ছুটি ছুটি', 'কে প্রথম চাঁদে গেছে বল দেখি', 'চলছে রেলের গাড়ি', 'আমরা তো আর ছোটো নই ছোটো নই' এসব গানই হিট। ছবিটির নাম 'জয় জয়ন্তী'। অরুন্ধতী দেবী ছোটোদের জন্য যে ছবি করলেন তার কাহিনীকার লীলা মজুমদার। ছবির নাম 'পদী পিসির বর্মী বাক্স'। ফেলুদা সিরিজের সূত্রপাত ১৯৭৪ সালে। প্রথম ছবি 'সোনার কেল্লা', পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজক। সত্যজিৎ রায় ছবির পরিচালক, চিত্রনাট্যকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর টেনিদাকে বড় পর্দায় টেনে তুলে নিয়ে এলেন পরিচালক উমানাথ ভট্টাচার্য্য। ছবির নাম 'চারমূর্তি'। সত্যজিৎ রায়-এর 'হীরক রাজার দেশে' অথবা 'গুপী বাঘা ফিরে এলো' সবই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এরই সিকিউল। তেমনই 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'গোরোস্থানে সাবধান', 'রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য', এগুলি ফেলুদা সিরিজের সিকিউল। সুনীল গাঙ্গুলীর কাকাবাবুকে প্রথম আমাদের সামনে নিয়ে এলেন তপন সিংহ। ছবির নাম 'সবুজ দ্বীপের রাজা'। ছবি এল ১৯৬৯ সালে। কাকাবাবুকে এরপর আমরা আবার পেলাম 'কাকাবাবু হেরে গেলেন', 'মিশর রহস্য' প্রভৃতি ছবির মধ্যে দিয়ে। মতি নন্দীর 'কোনি' গল্পটিকে চিত্ররূপ দিলেন অগ্রগামী গোষ্ঠীর সরোজ দে। প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সৌমিত্রের মুখের সংলাপ 'কোনি ফাইট কোনি' আজও দর্শকের কানে বেজে আছে। বিখ্যাত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু কাহিনী নিয়ে কিশোর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে। যার মধ্যে রয়েছে 'পাতাল ঘর', 'বন্দুকবাজ', 'গোঁসাই বাগানের ভূত', 'ছায়াময়' প্রভৃতি।

সমরেশ বসুর গোগোলকেও বড় পর্দায় নিয়ে আসা হয়েছে। ছবির নাম 'গোয়েন্দা গোগোল'। আশীষ মিত্রের পরিচালনায় সম্প্রতি পেলাম 'আমরা পাঁচ' ছবিটি। কিন্তু বর্তমানে যে ছবিটির কথা সবার মুখে মুখে সেটি বিভূতিভূষণের কিশোর সাহিত্য 'চাঁদের পাহাড়'। শঙ্কর চরিত্রের অ্যাডভেঞ্চারকেই তুলে ধরেছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। অদূর ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক ছবি আমরা পাব নিশ্চয়।

Tommorow's Foundation

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা এবং কর্তব্যের প্রচেষ্টা

কাবেরী ব্যানার্জী

Tomorrow's Foundation-এর দেওয়া ব্যাগ নিয়ে ছেলেমেয়েরা। ছবি: সংস্থার সৌজন্যে।

"Tommorow's Foundation" সংক্ষেপে TF নামে এই সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। প্রতিষ্ঠানটির নামের মধ্যেই, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বের একটি আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানের শিশু, ভবিষ্যতে একজন দায়িত্ববান সুনাগরিক হয়ে উঠবে -- এই সুন্দর ভাবনাটিকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিষ্ঠানটির গড়ে ওঠার ইতিহাস।

TF-এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ''উত্তরণ বাস্তার'' আরম্ভ হয় ২০০৮-২০০৯ সালে। ছত্তিশগড় রাজ্যের দান্তেওয়াড়া ও বীজাপুর জেলার হিংসায় আক্রান্ত শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশে এই প্রকল্পটির শুভারম্ভ। দান্তেওয়াড়া মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে মুড়িয়া, দান্দামি, মারিয়া, গোণ্ডা, দৌরলা, হালবা এইসব আদিবাসীদের বসবাস। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর দুর্ঘটনার জন্য প্রায় ৩৫০ জন মানুষ মারা যান। এবং ৫০ হাজার মানুষ দান্তেওয়াড়ার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। বেশ কিছু শিশু অনাথ হয়ে পড়ে। ক্যাম্পগুলিতে সরকারিভাবে রাজীব গান্ধী শিক্ষা মিশন এবং সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হয়। ২০১০ সালের ১৫ জানুয়ারি ৫০টি অনাথ বালককে নিয়ে TF এই উত্তরণ বাস্তার প্রকল্পটি আরম্ভ করে। দান্তেওয়াড়া ও বীজাপুর জেলায় ১০০ জন অনাথ বালিকা ও ৫০ জন অনাথ বালকের জন্য দুটি হোম তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনাথ শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, নিয়মিত পড়াশোনা, খেলাধূলা, শরীর চর্চার মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে তোলা। পাশাপাশি নানারকম স্বনির্ভরতার ক্রিয়াকলাপ শেখানো হয়। সরকারি স্কুল-কলেজেই সেইসমস্ত বালক-বালিকাদের পড়তে পাঠানো হয়। দেখা গেছে এই সব আদিবাসী ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থেকেই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসার মানসিকতা ফিরে পাচ্ছে।

TF-এর মূল উদ্যোক্তা শ্রীমান অরূপ ঘোষ ও স্বরূপ ঘোষ, ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি নতুন কিছু করার কথা ভাবতো এবং প্রায়ই অভিনব সব কর্মকাণ্ডে নিজেদের যুক্ত রাখতো। নিজেদের আশেপাশের মানুষজনকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের কিভাবে জড়িয়ে নেওয়া যায় সে চেষ্টায় অবিরল নিজেদেরকে সামিল করতেই এই ধরনের সংগঠন। এই সব জনদরদী কাজে বাবা মায়ের সহযোগিতাও সবসময় পেত। এইভাবেই একদিন মাদার টেরিজার সঙ্গে এই দুই ভাইয়ের আলাপ পরিচয় হয় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে মাদারের খুব কাছের মানুষ হয়ে যায়। পরবর্তিতে মাদারের আশীর্বাদে ১৭ জন দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে প্রথাবহির্ভূত ক্লাস আরম্ভ করে। ক্লাস হত মাদারের 'নির্মল হৃদয়' বাড়ির ছাদের এক কোনায়। ক্লাস চলাকালীন অল্প দুধ ও বিস্কুট শিশুদের দেওয়া হত যাতে খাবারের লোভে অন্তত বাচ্চারা আকৃষ্ট হয়ে ক্লাসে আসে। ১৯৯২ সালে অরূপ ও স্বরূপের ডাকে সেই ১৭টি শিশু থেকে বেড়ে ৫০টি শিশু হল। ধীরে ধীরে TF-এর কর্মীদের শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যবহার, আন্তরিকতা কালীঘাটের বস্তি এলাকায় অত্যন্ত সুপরিচিত হল এবং শিশুদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল।

কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষজনের পাশাপাশি এমন বহু পরিবার আছে যাদের শিশুরা নিয়মিত স্কুল কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করা বা অসুখ করলে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া, নির্মল আনন্দময় জীবনযাপন করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। Tomorrow's Foundation-এর কর্মীরা এইসব মানুষদের পাশে গিয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে চলেছে। ১৯৯৪ সালে শিশু সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার জন্য TF নিজেদের একটি আস্তানা করার কথা ভাবছিল। আর ঠিক ওই সময়েই সৌভাগ্যবশত 'জেনিন ওয়ালটার' নামে একজন ফরাসি শিক্ষাবিদ TF-এর সঙ্গে সানন্দে যুক্ত হলেন। কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের একটি কর্পোরেশন স্কুলের সঙ্গে আলোচনা করে শিশুদের সেখানে নিয়মিত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হল। কলকাতা কর্পোরেশন সাগ্রহে ছোটোদের মিড-ডে মিল, বইখাতা, ইউনিফর্ম এসবের ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়া জেনিন ওয়ালটারের সাহায্যের হাত তো ছিলই।

১৯৯৫ সালে TF-এর কর্মীরা একটি Vocational Training Centre আরম্ভ করল প্রায় ৮০জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে। নানারকম হাতের কাজ, ছবি আঁকা, সেলাই, ইত্যাদি ছাত্ররা শিখতে আরম্ভ করল। বেশ কিছু নামীদামী চিত্রকর, শিক্ষাবিদ নিজেদের আগ্রহেই ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। ছোটোদের তৈরি gretings card, album, নানা আকারের gift box, কাপড়ের ও কাগজের ব্যাগ, বিবাহের কার্ড, ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হতে আরম্ভ করল। শিক্ষার্থীরা খুব উৎসাহ পেতে লাগল। ১৯৯৬-৯৭ সালে শরৎ বোস রোডে আরও একটি কর্পোরেশন স্কুলকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা হল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন ১২০জন। ছোটোদের পড়াশোনার সঙ্গে তারা যে পরিবেশে থাকা -খাওয়া করে অর্থাৎ তাদের পরিবারকেও দেখাশোনা করার প্রয়োজন মনে হল TF-এর। ছাত্রদের বাবা মায়ের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা, অসুখ করলে দেখাশোনা, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া এসবই নিয়মিত ভাবে হতে থাকল। এতবড় কর্মযজ্ঞে ফরাসি সাহায্য এবং বহু সহৃদয় ব্যক্তির দান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষাভারসহ নানান কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল এই সংস্থা। ১৯৯৭-৯৮ International Youth Exchange Programme-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেশ কিছু ফরাসি ছাত্রছাত্রী কলকাতায় এসে TF-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নানারকম শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সেই সময় কলকাতার দুটি ছাত্রের আঁকা ছবি ফ্রান্সে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়।

১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে TF-এর সমস্ত কর্মীরা যে দায়িত্ব পালন করেন তাতে Foundation-এর খুবই সুনাম হয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং প্রায় ১৪০ হয়। এদের মধ্যে কিছু মেধাবী ছাত্রকে বাইরে হোস্টেলে রেখে পাড়ানোর ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯৯৯ সালে UNESCO-র মূল্যায়ণে Tomorrow's Foundation-কে পূর্ব ভারতের "Model NGO" আখ্যা দেওয়া হয়।

২০০২ থেকে ২০০৩-এ টালিগঞ্জে বেশ কিছু বস্তি উচ্ছেদের সময় বহু শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয় TF-র কর্মীরা। প্রায় ২৪৫ জন শিশুর Health Insurance-এর ব্যবস্থা করা হয় "Green Club" নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে। "Goal India" সংস্থার দ্বারা কিশোর এবং যুবক ছাত্রদের skill development-এর ক্লাস নেওয়া আরম্ভ হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ খুবই সফলতার সঙ্গে চলতে থাকে। কলকাতার পূর্বদিকে ২০০৫-২০০৬ সালে ট্যাংরার কাছে Foundation-এর একটি শাখা খোলা হয়। সেখানেও নানারকম Multi Activity Project আরম্ভ হয়। Concern India Foundation, Reach India Project এইসব সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৪০০ জন শিশুর যথার্থ Birth Certificate তৈরি করানো হয়। শিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এই সংস্থার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে হয়েছে তা অনেকটাই গল্প কথার মত। শিশুদের অসহায়তা বার বার নজরে এসেছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে TF-এর সঙ্গে গত ১৩ বছর যুক্ত আছি। খুব কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এই মুহূর্তে একই সঙ্গে প্রায় দশটি প্রকল্প কাজ করে চলেছে। যেমন মাদার প্রজেক্ট, ওপেন স্কুল, মডেল স্কুল, চরৈবেতি, কীপ, উত্তরণ বীজাপুর, উত্তরণ দান্তেওয়াড়া, দিশারী, জ্যোতিষ্ক, পূর্ণ-আর। এত সব প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে চালাতে একশজন কর্মী নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। বেশির ভাগ কর্মীই মানসিকভাবে TF-এর কাজকর্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং সততার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

অর্থ আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা প্রচণ্ড অর্থ-সমস্যার সম্মুখীন হামেশাই হয়ে থাকি। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে আমাদের প্রায় ১০০ জন স্পনসর আছেন। এছাড়াও সরকারের কাছ থেকেও কিছু কিছু সাহায্য আসে। তবুও অর্থাভাব আমাদের প্রতিনিয়ত চিন্তায় রাখে। এতদ সত্ত্বেও সরস্বতী পুজো, পিকনিক, এক্সকারশন, স্পোর্টস, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসবের মাধ্যমেই শিশুদের ভালো রাখার চেষ্টা আমাদের নিয়মমত করতেই হয়।

TF-এর শিশুদের সংখ্যা এখন প্রায় ৮০০০ ছাড়িয়েছে। সমস্যা নানারকম থাকলেও আশা রাখি এই প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু করেই আগামীদিনেও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। যদি কোনও আগ্রহী ব্যক্তি TF সম্বন্ধে জানতে চান বা যুক্ত হতে চান তাঁকে সাদর আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন নিম্ন ঠিকানায়।

tf@tomorrowsfoundation.org
www.tomorrowsfoundation.org

কি আলোয় দেশের শিশুরা!

নীতিশ মুখার্জি

'বচপন বাঁচাও আন্দোলনে'র পুরধা কৈলাস সত্যার্থী দীর্ঘকাল ধরেই লড়ে আসছেন 'শিশুশ্রম বিলোপে'র লক্ষ্যে, শোষণের নিগড় থেকে উদ্ধার করে 'শৈশবকে তার স্বাভাবিক অধিকার' ফিরিয়ে দিতে। সাহসের সঙ্গে অজস্র আন্দোলন সংগঠিতও করে চলেছেন কৈলাস সত্যার্থী।

দেশের আম-জনতা নিশ্চয় এখনও ধন্দেই, কী কারণে ভারতের মত দেশে 'শিশুশ্রম বিলোপে'র লক্ষ্যে, 'শৈশবকে তার স্বাভাবিক অধিকার' ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এত বড় একখানা পুরস্কার এসে গিয়েছিল! ভারতের সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারবেনই বা কি করে, যখন দেশের অর্থনৈতিক চেহারার সঙ্গে শিশুশ্রম একটা স্বাভাবিক দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় অধ্যায় আজও নিবিড়ভাবে! ভারতের ছেলেমেয়েরা খাটবে না তো করবেটা কী? বাড়ির বড় ছেলে বা মেয়ে না-খাটলে তাদের পরের ভাইবোনগুলিই বা খাবে কী? সবটা কি আর বাবা-মায়ের একার পক্ষে টানা সম্ভব?

আট-নয় বছরের বাচ্চা মিষ্টি ছেলেটি দোকানে চা দিত, এঁটো বাসন মাজত, সে যদি এখন ব্যাগভর্তি বই-খাতা নিয়ে কাছের ইস্কুলে যেতে শিখে ফেলে তবে চা-দোকানের হাল কে ধরবে? আর ছেলেটির রোজগারের পথ চেয়ে বসে থাকা তার বাপ-মায়ের কাছে যেটুকু সামান্য টাকা আসছিল সংসারের নিত্য দুঃখ ঘোচাতে, তা-ও তো বন্ধ হয়ে যাবে ওই পড়াশোনার ঠেলায়! এ কি করে সম্ভব!

ষোল বছরও হয়নি। মেয়েটি একটা পাসও দিয়েছিল। কোথাও একটা কাজ জুগিয়ে উঠতে পারেনি মেয়েটি। বাড়িতে বাড়তি রোজগারের প্রয়োজন। শেষে গ্রামের মাসির হাত ধরে মুম্বাই-না-দিল্লিতে, কোথায় যেন কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম দু-চার মাস বাড়িতে টাকাও পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারপর! কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সবাই চুপচাপ! আমার বাড়ির কাজের মাসির বারো বছরের মেয়েটা আর আট বছরের ছেলেটা হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল একইসঙ্গে, একইদিনে। পুলিস, থানা করে ক'দিন পরে মেয়েটার খবর পাওয়া গিয়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়! আর ছেলেটা? তার খবর শেষ পর্যন্ত মাসি জোগাড় করতে পারেনি বলেই জানি! এখন আর মাসি আসে না।

অনাথ, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের দলই তো হোমগুলিতে থাকতে বাধ্য হয়। মেয়েদের হোমে যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনার খবর হরদম সকালের কাগজের একটা কলাম। যেন এটাই স্বাভাবিকতা! হোমের পরিবেশ এমনিতে অমানবিকই। সেখানে থাকা ছেলে-মেয়েগুলোর কপালে স্বভাবতই ভাল কিছু জোটে না। আর জুটবেই বা কেন?

দেশের শহর-গ্রাম নির্বিশেষে ঘোরাঘুরি করলে হরবকত দেখা যাবেই হাড় জিরজিরে, বুকের পাঁজর গোনা যায়, অপুষ্টিতে ভোগা, মাথাটা শরীরের থেকে পেল্লায় বড় শিশুগুলোকে। অপুষ্টিতে ভোগা এই মারাত্মক চেহারা নিয়ে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। বেড়াবেও!

সপ্তাহের পাঁচটা দিন ইস্কুলে গেলে অন্তত দুপুরের খাওয়াটা পাওয়া যাবে। সঙ্গে পড়াশোনা! কিন্তু বাড়ির শিশুকে যে ইস্কুলে পাঠানোই দায়! কিছুতেই সে যেতে চায় না ইস্কুলে। পড়া ধরতে পারে মাস্টার! সে যে কিছুই বোঝেনি! শেখেনি! মাস্টারমশাই শিক্ষাদানে যতটা না আগ্রহী, বেত মারতে ততটাই শৈল্পিক। ইস্কুলের প্রতি কোনও টান-ই বোধ করে না শিশুটি। সংসারের আর্থিক অনটনে যেদিন যেদিন দুপুরে খাওয়ার অবস্থা থাকে না বাড়িতে, বাবা-মায়ের চাপে যদিবা ইস্কুলে খাবারের লোভে যেতে হয়েছে, সেদিনই মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে তার অসুস্থতা আর নতুন কি!

এই হল আমাদের দেশে 'শিশুশ্রম বিলোপ' বা 'শৈশবকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার' আজও প্রকৃত চেহারা! যদিও নিয়ম করে আমরা 'শিশুদিবস' উৎসাহ-উৎসবের আকারে পালন করেই আসছি সেই শৈশব থেকে!

সময়-অসময়ে উচ্চারণ করা কর্তব্যবোধ করি -- শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ! লালিত-পালিত হওয়ার কথা। বিষয়টা রাষ্ট্রের কাছে যে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তা বোঝার সহজ উপায় এখনও পাওয়া যায়নি। বলাই বাহুল্য, তাই রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে প্রথমেই কোপ পড়ে শিশু-সংক্রান্ত বরাদ্দে। প্রশ্ন তোলার দিন এসেছে, দু'চারটে শিশু-সংক্রান্ত সম্ভাবনাময় প্রকল্প গড়ে ওঠা সত্ত্বেও দেশের শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র সুরক্ষিত করে তুলতে, রাষ্ট্রনায়করা আজও কেন ব্যর্থ?

ভারতের শিশু শ্রমিক

বরুণদেব ঘোষ

শিশুশ্রম ভারতবর্ষের মত উপমহাদেশে একটি সামাজিক ব্যাধি। এদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর আশ্রয় নেই, সহায়-সম্বল নেই। বাধ্য হয়ে ওরা অতি অল্প মজুরিতে শ্রমিকের কাজ করে। শিশুশ্রমিক নিয়োগ করলে মালিকপক্ষের প্রধান সুবিধে আর্থিক সাশ্রয়। যে মজুরির বিনিময়ে বড়দের দিয়ে কাজ করাতে হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তার অর্ধেকেরও কম দিলে চলে। দ্বিতীয় সুবিধে, শিশুরা বড়দের মত প্রতিবাদ করে না, ইউনিয়ন গড়ে না, শোষণ কিভাবে চলছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ওদের ওপর কৌশলে চাপ সৃষ্টি করে বাড়তি কাজ আদায় করা খুব সহজেই সম্ভব হয়।

সম্প্রতি ভারতের শিশুশ্রমিকদের নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, যে ধরনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওদের কাজ করতে হয়, তা দেহ ও মনের দিক থেকে বিশেষ ক্ষতিকর। এই সংস্থার মতে অপরিণত বয়স্ক শিশুদের বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করাও অত্যন্ত আপত্তিকর। বিপজ্জনক কাজ বলতে এখানে উদাহরণ হিসাবে বাজি তৈরির কথা বলা যেতে পারে। তামিলনাড়ুর শিবকাশী অঞ্চলে হাজার হাজার শিশু এই কাজে নিযুক্ত। এদিকে বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে ভারতের শিশুশ্রমিকরা যে সব শিল্পের উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত, সেই সব শিল্পজাত পণ্য তারা ক্রয়ে অপারগ। উদাহরণ হিসাবে এখানে উত্তরপ্রদেশের কার্পেট শিল্পের কথা বলা যেতে পারে। বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান মনে করে, শিশুশ্রমিক নিযুক্ত করে উৎপাদন ব্যয় কমাবার চেষ্টা ভারতের কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য একটাই উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন পণ্য বাজারে বিক্রি করা এবং এই ভাবে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বাজার দখল করা। বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই সুযোগ দিতে বিদেশিদের নীতিগত আপত্তি।

নীতির প্রশ্ন অবশ্য নানা কারণেই উঠতে পারে এবং সে কারণগুলোর প্রায় সবই সঙ্গত। কোনও শিশু লেখাপড়ার সুযোগ পেল না, স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠার অবকাশ পেল না। তার শৈশব কাটল চায়ের দোকানে কাপ-ডিস পরিষ্কার করে, অথবা কোনও বন্ধ কারখানার দমবন্ধ করা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। এ কোন সামাজিক বিচার? আট দশ বছরের যে শিশুটি ইঁটপাথর মাথায় নিয়ে মজুরের কাজ করছে অথবা ঝাড়ুদার বা বুট পালিশওয়ালা হয়ে গিয়েছে, সমাজের কাছে তার অপরাধ কী? এ প্রশ্নও সঙ্গত কারণে উঠতে পারে। যেসব শিশু বাড়িতে কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রে সুরক্ষার সুযোগ হয়ত তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু তারাই বা সামাজিক ন্যায়বিচার কতটুকু পায়? যখন-তখন মুখ-ঝামটা, চড়-চাপাটি তাদের ভাগ্যেও কি জোটে না? এছাড়া নিয়োগ কর্তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক ও দিন-যাপনের পার্থক্যটা প্রকট হয়ে তাদের কাছে ধরা দেয় তখন শিশুমনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? অবশ্য বাড়িতে কাজ করা শিশুদের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা নরম-পন্থা নেবার পক্ষপাতী। বলা হচ্ছে, তাদের অবশ্যই লেখাপড়া শেখার সুযোগ দিতে হবে। কার্যত দেখা যায় কিছুটা সুযোগ অর্থাৎ সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাবার অবকাশ অনেকেই পায়। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপে বাড়িতে বসে পড়ার সময় বেশির ভাগ শিশু পায় না। মনে হয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাড়িতে কর্মরত শিশুদের কথা চিন্তা করলে ওদের সমস্যা সমাধানের পথ অনেকখানি সুগম হতে পারে। অপারেশন রিসার্চ-গ্রুপ এর হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ।

কলকারখানায় বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের কাজ থেকে সরিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ৮৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করেছিল। প্রকল্প তত্ত্বাবধানের জন্য তৈরি হয়েছে ''ন্যাশনাল অথরিটি অব চাইল্ড লেবার'' যার নেতৃত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী। এছাড়া পাঁচ থেকে সাতজন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা, অর্থ, ব্যয়, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, নগরোন্নয়ন, ও সমাজকল্যাণ সচিবেরা এর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। প্রকল্পের কাজ যেখানে যেখানে চলবে সেখানকার রাজ্য সরকার, জেলা কর্তৃপক্ষ ও সাংসদদেরও সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

বিপজ্জনক কাজ থেকে শিশুদের সরিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার পরিকল্পনা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এই শ্রেণীর কাজে নিযুক্ত শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করতে ১৯৮৬ সালে আইন পাশ হয়েছে। এবং এখনও একই উদ্দেশ্যে একটি সরকারি প্রকল্প চালু রয়েছে। তবে এখন যে প্রকল্পটি চালু তার এক্তিয়ার অনেক সীমিত এবং তার জন্য বরাদ্দ অর্থও অনেক কম।

নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৯৪-এর অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, বিপজ্জনক কাজে ২০ লক্ষ শিশুশ্রমিককে পড়াশোনা শেখানো। এই পড়াশোনার মধ্যে পেশাগত শিক্ষাও থাকবে। এমনকি শিশুশ্রমিকদের কাজ থেকে সরিয়ে আনার মূল যে সমস্যা, অর্থাৎ এদের রোজগারের ওপর স্ব স্ব পরিবারের নির্ভরতা, সেদিকেও সরকার লক্ষ্য রাখবে। তবে অর্থনীতিবিদগণের মতে, শিশুশ্রমিকরা যে টাকা রোজগার করে, এই বিকল্প কর্মসূচি দিয়ে সেই পরিমাণ অর্থ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন রাজ্য যেসকল প্রস্তাব দিয়েছে, তার মধ্যে শিশুশ্রমিক নিয়োগ না করলে কর ছাড়ের সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি।

এদিকে ১৯৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশের শিশুশ্রম প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিন থেকেই ভারতের সর্বত্র ১৪ বছরের অনুর্ধ্বদের নিয়োগ করা আইন-বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। শিল্পে নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল গঠন করা হবে। এতে প্রত্যেক শিশুর জন্য মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা জমা পড়বে। সংশ্লিষ্ট শিশুশ্রমিকদের নিয়োগকর্তা বহন করবেন ২০ হাজার টাকা, বাকি ৫ হাজার টাকার দায়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কল্যাণ তহবিলের অর্থ শিশুশ্রমিকদের শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশে ব্যয় করা হবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছয় মাসের মধ্যে শিশুশ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপণ করতে হবে। বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শিশুরাই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। বিচারপতিরা বলেন, ১৪ বছরের অনুর্ধ্ব শিশুদের চাকরিতে নিয়োগ করা ভারতের সংবিধান বিরুদ্ধ।

এদেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শিশুশ্রমিকদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। সেই সঙ্গে নিদারুণ দারিদ্রের চাপ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ঠেলে দিচ্ছে চরম অনিশ্চিতের পথে। এক্ষেত্রে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব না হলে শিশুশ্রমিকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানও সম্ভব নয়।

A Welfare Endeavour of Gandhi Seve Sangha

GSS HOSPITAL OPD SERVICES

DOCTORS & TIME SCHEDULE	GANDHI MORE, SREEBHUMI, KOL 700 048	
MEDICINE		
Dr. Sudipta Chattopadhyay	MD(Med), DNB(Med)	FRI 4-6 PM
Dr. Subhadip Pal	MD, MRCGP	TUES 5-7 PM
DIABETOLOGY		
Dr. S. B. Roy Choudhury	MBBS, MRCP, MSc (Diab), PGDIP (Geriatric Med)	TUES 4-6 PM
CARDIOLOGY		
Dr. Swapan De	MD, DM	MON 7-8 PM, THURS 4-5 PM
Dr. Sumit Acharya	MBBS, MD(Med), MRCP(UK), MRCP(Ireland), MRCP(Galsgow)	MON & FRI 4-6 PM
Dr. Anirban Kundu	MBBS, DIP CARD	SAT 10-12 AM
GASTROENTEROLOGY		
Dr. Sabyasachi Ray	FRCPI, FACP	THURS 7-8 PM
Dr. Subhabrata Ganguly	MD, DM	TUES 6-8 PM
ORTHOPAEDIC		
Dr. Sudipta Bandhopadhyay	MS(Ortho)	THURS 10-11 AM
GYNAECOLOGY & OBSTETRICS		
Dr. Ashok Mandal	MD, DGO, FSMF	TUES & FRI 12 AM-1 PM
Dr. Bandana Pal	MBBS, DGO	WED & FRI 6-7 PM
Dr. Trina Sengupta	MBBS, DGO, DNB	THURS 4-6 PM
Dr. Suchismita Das	MBBS, DGO	TUES 4-5 PM, WED 9-11 AM
PAEDIATRIC		
Dr. R. K. Biswas	MD, DCH	FRI 10-12 AM
CHEST MEDICINE		
Dr. A. C. Kundu	MBBS, DTCD(Cal)	MON 4-5 PM
FAMILY MEDICINE & SKIN		
Dr. Joy Basu	MBBS, DNB, FRSM(London)	MON 6-8 PM, THURS 6-8 PM
Dr. Subhas Kundu	MBBS, DVS, ISHA(Bangalore)	TUES 11-12 AM
SURGERY		
Dr. Diptendu Sinha	MS, FAIS	MON, WED 11 AM-1PM
ONCOLOGY		
Prof. Dr. Anup Majumdar	MD(Cal)	WED 11 AM-1 PM
Prof. Dr. Srikrishna Mandal	MD(PGMIR, Chandigarh)	TUES 7-8 PM

ENT
Prof. Dr. Ajit SahaMBBS(Gold,MS, DLO (London) Rcs, (Eng). MS (Eng)TUES, Thurs, 10am-12pm
Dr. Debarshi Roy MS (Gold), MRCS, UK, DOHNS UK Fri. 10-11AM

EYE
Dr. Saibal maitra MS (OPHTH) Wed. 6-7PM Sat. 5-60PM
Dr. Rupam Roy MS (OPHTH), Mon 6-8PM

Gen. Physician
Dr. Saradi Banerjee Every day
Dr. Indranil Basak ,,
Dr. Sayantan Manna ,,

OPD opens MON to SAT, 9 AM-1 PM, 4-8 PM.

Appointment & Enquiry 9903321777, 9836066910.

Doctor consultation fees Rs.100, 150, 200 only. All diagnostic tests at high discount rate at **UNIMED, APOLLO CLINIC & HEALTH CARE** (Jessore Rd.).

For details visit www.gandhisevasangha.org; mail to gandhisevasangha1946@gmail.com; or contact Goutam Saha, Secretary 9432000260.

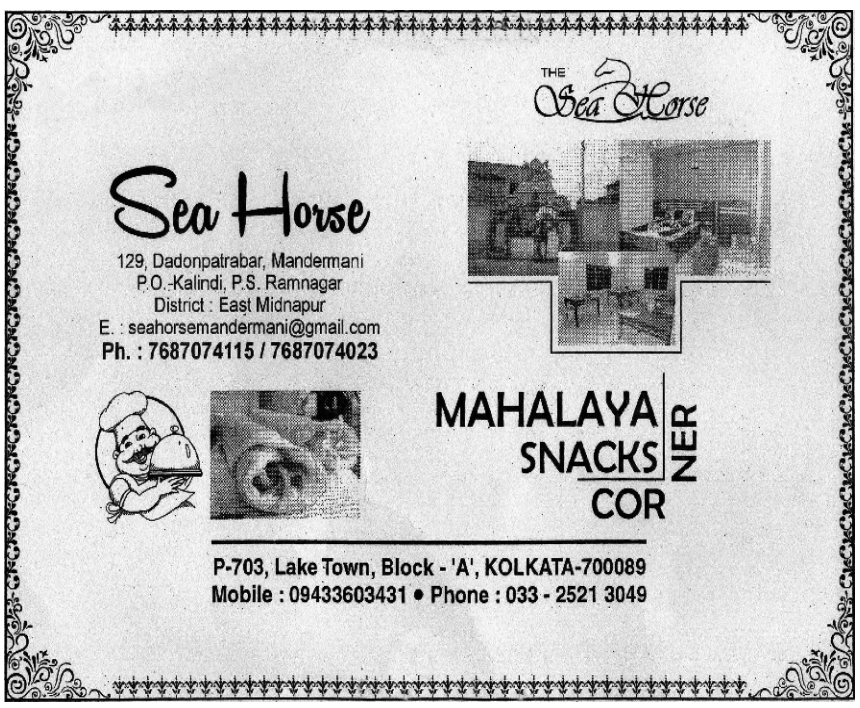

দুঃস্থ ক্যান্সার রোগীদের সাহায্যার্থে তহবিল

সেবক প্রতিবেদন: গান্ধী সেবা সঙ্ঘের 'সেবা নিবাসে' নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা আসেন থাকবার জন্য। যেসব প্রবাসী ক্যান্সার রোগীরা কোলকাতা শহরে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করান, তাঁরা সুলভে 'সেবা নিবাসে' থাকবার সুযোগ পান। 'সেবা নিবাস' কর্তৃপক্ষ অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন, অনেক রোগীই নিদারুণ আর্থিক অসুবিধের মধ্যেও চিকিৎসা করাচ্ছেন কোনওরকমে। তাঁদের অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা নানান সময়ে প্রকাশ করে ফেলেন আমাদের কাছে। এসব দেখেই সাহায্য তহবিল তৈরি করতে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়েছেন। সামান্য অর্থ দিয়ে কিছু ওষুধ কিনে দেওয়া, রক্ত কেনার ব্যয় ভার বহণ করা, বা অন্য কোনও নার্সিংহোমে রেখে রক্ত দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা -- এই ধরনের সুবিধে বা সাহায্য করা সেবা সঙ্ঘের অবশ্য কর্তব্য। এই সুবাদে সকলের কাছে আন্তরিক আবেদন যে-যেমন পারবেন, তহবিলে অর্থ সাহায্য করবেন। এই প্রসঙ্গে জানাই ডঃ রেখা রায়চৌধুরী গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি মাসে ৫০০০/- টাকা করে এই তহবিলে নিয়মিত দান করছেন। এ জাতীয় দানের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘের মনোবল অনেক বেড়ে ওঠে। তাই বলি যে যেভাবে পারবেন এই তহবিলে সাহায্য করুন। যা প্রকৃতই মানুষের উপকারে আসবে। ধন্যবাদ।

ইতিমধ্যে যাঁরা এই তহবিলে অর্থ সেবা করেছেন:

১) ডঃ রেখা রায়চৌধুরী ১৫,০০০ টাকা
২) শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বাগচী ২,৫০০ টাকা
৩) শ্রীমতী অন্বেষা সাহা ১,০০০ টাকা
৪) শ্রীমতী অভিষিক্তা সাহা ১,০০০ টাকা

এই প্রসঙ্গে জানাই, গত মহালয়ার শুভ দিনে যে ক'জন রোগী ও তাঁদের সঙ্গীরা 'সেবানিবাসে' ছিলেন তাঁদেরকে শ্রী অরুণকুমার বাগচী মহাশয় নিজের স্বর্গীয় পিতাকে স্মরণ করে অন্ন সেবা করিয়েছিলেন। আমরা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সকলে তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'সেবা নিবাসে'র তিনতলায় নবনির্মিত ১১টি ঘর ও 'সেবা নিবাস' সম্প্রসারণে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন:

১) শ্রীপ্রবীর কুমার কুণ্ডু	১,৭৫,০০০/-	২) শ্রীমতি হৈমন্তী দাশগুপ্ত স্মরণে	১,০০০০০/-
৩) শ্রীমতি মঞ্জু মুখার্জী	১,০০০০০/-	৪) শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	৫০,০০০/-
৫) Planete Couer	৫০,০০০/-	৬) যোশী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট	২৫,০০০/-
৭) শ্রী প্রণব দত্ত	২৫,০০০/-	৮) শ্রী শঙ্করলাল ঘোষাল	২০,০০০/-
৯) শ্রী পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী	২০,০০০/-	১০) শ্রীমতি সাবিত্রী প্রসাদ	৫,০০০/-
১১) ডঃ অসীম চ্যাটার্জী	৫,০০০/-	১২) শ্রী এন রামচন্দ্রন	৫,০০০/-
১৩) শ্রীমতি শিখা মজুমদার	৫,০০০/-	১৪) শ্রীমতি ঋতা বসু	৫,০০০/-
১৫) শ্রীমতি পদ্মা সাহা	৫,০০০/-	১৬) শ্রীমতি মায়া সিংহ	৫,০০০/-
১৭) শ্রী ইন্দ্রনীল গুহ	৫,০০০/-		

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে যাঁরা যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন:
১। শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য ৫০০১ টাকা
২। শ্রী শিবরঞ্জন রায় ৫০০১ টাকা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ৮ম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com